'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ. তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৩০সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২১

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

অহিংসার পূজারী রূপে গান্ধীজি

ড. মৃণাল কান্তি সরেন

জাতির জনক হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর নাম কারোরই অজানা নয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোর বন্দর শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। পিতার নাম কমরচাঁদ গান্ধী এবং মাতার নাম পুটলী বাঈ। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী অসীম সাহসী মহাত্মাগান্ধীর এই নীতিতে আসমুদ্র হিমাচলের হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ ত্যাগ করে শহীদ হয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'দাদা আবদুল্লা এন্ড কোম্পানী'র হয়ে একটি মামলা লড়তে দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে হয়েছিল। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের প্রতিবাদে গান্ধীজি 'নাটাল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠন করেন। এখানে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের নিয়ে গঠিত অহিংস সত্যাগ্রহ করে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। ড. এ. আর. মেহরাত্র বলেন—

"ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ উপহার স্বয়ং গান্ধীজি।"[১]

লিও টলস্টয় এর 'Kingdom of God' এবং জন রাস্কিনের লেখা 'Unto the Last' গ্রন্থ থেকে তিনি অহিংস সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

তথাকথিত অহিংসাই ছিল 'গান্ধীবাদ'। গান্ধী-নেতৃত্ব ও গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস সংগ্রামের মূল ভিত্তি। গান্ধীজি ছিলেন আজীবন অহিংসার পূজারী, অহিংসাই ছিল তাঁর 'জীবনের মূলভিত্তি, মূলনীতি ও মূল বিষয়বস্তু'। গান্ধীজির কথায় 'অহিংসা কেবল একটি কর্মকৌশল নয়, অহিংসা হই জীবনের ও সংগ্রামের সর্বক্ষেত্রে আচরণীয় একটি মূল নীতি'।[২] অহিংসা ছিল গান্ধীজির জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন যে, এই রক্তপাতের বিনিময়ে অর্থাৎ হিংসার দ্বারা লব্ধ ভারতের স্বাধীনতাও তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। চিন্তায়, আচরণে, অস্থিমজ্জায় তিনি ছিলেন অহিংসার পরম সাধক। সুতরাং কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক রূপে এই অহিংসা দ্বারাই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরম্ভ, গতি ও পরিণতি নির্ধারণ করেছেন। অতএব গান্ধীবাদ ও গান্ধী নেতৃত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য গান্ধীর অহিংসা নীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অপরিহার্য।

গান্ধী ছিলেন আজীবন অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী একজন মহান জাতীয়তাবাদী নেতা। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনে গান্ধীজি এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতি সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত। তিনি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের অস্ত্র হিসাবে সত্যাগ্রহ নীতি প্রয়োগ করেন। সত্যাগ্রহের দুইটি মূল আদর্শ হল— (১) সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং (২) অহিংস উপায়ে সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়া।[৩] একজন আদর্শ সত্যাগ্রহী কোনো অবস্থাতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবে না। আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় সে কিছুতেই হিংসার আশ্রয় নেবে না। এইজন্য প্রয়োজন অনুশীলন ও অধ্যাবসায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় একজন সত্যাগ্রহীকে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করতে হবে। গান্ধীজির মতে দুর্বল বা কাপুরুষরাই হিংসার আশ্রয় নেয়। তিনি বুঝেছিলেন যে, শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নিরস্ত্র ভারতবাসীর সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতবাসীর সাফল্য সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারতবাসীর নৈতিক শক্তি ও অহিংস পদ্ধতিকে ভিত্তি করে অধিকার ও সম্মান রক্ষার সংগ্রামে সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রয়োগ করেন। সত্যাগ্রহের আদর্শ জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নীতির বাস্তব প্রয়োগ ঘটে বিহারের চম্পারণে। এখানকার কৃষক শ্রেণি গান্ধীজির সংগ্রামী ভাবমূর্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। চম্পারণের কৃষক শ্রেণি নীলকরদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজির সাহায্য প্রার্থনা করে। গান্ধীজি এই ডাকে সাড়া দেন এবং স্বয়ং চম্পারণে উপস্থিত হয়ে কৃষকদের দুর্দশা দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থের ২৫ শতাংশ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে, এবং অল্পকালের মধ্যেই নীলকররা এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ভারতে চম্পারণ ছিল গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আদর্শের সফল প্রয়োগক্ষেত্র। চম্পারণ সত্যাগ্রহ ছাড়াও আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ এবং খেদা সত্যাগ্রহও গান্ধীজি শ্রমিক ও কৃষকদের দাবী আদায়ে সফল হয়েছিলেন।

গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই সর্বপ্রথম শহরের মধ্যবিত্তদের গণ্ডি ভেঙ্গে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল গ্রামের কোটি কোটি নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে। অহিংস উপায়ে হয়ে ওঠা অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও কর্মসূচি সীমাবদ্ধ হলেও জনসাধারণ এই লক্ষ্য নিয়েই বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে গান্ধীজি বরদৌলিতে সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার আগেই অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। কারণটা হল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের কাছে চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিশ এক শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণ করে একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলে প্রায় তিন হাজার ক্ষিপ্ত জনতা ওই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, এবং পুলিশ দলের উপর আক্রমণ চালায়। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের সংঘর্ষে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় গান্ধীজি ব্যথীত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের এক কার্যকরী সভায় গান্ধী প্রস্তাব করেন যে— অসহযোগ

আন্দোলন অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হোক।[৪] এরপর ২৫ ফেব্রুয়ারি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অহিংস আন্দোলন বন্ধ করে দেন। চৌরিচৌরা ও গোরক্ষপুরের ঘটনা, মোপালা বিদ্রোহ প্রভৃতি কৃষকদের সহিংস সংগ্রামের রূপ দেখেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গণসংগ্রামে 'অহিংসা অমান্য করা হয়েছে' বলেই গান্ধীজি ১৯২১ সালের জাতীয় সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এইভাবে অহিংসার নামে গণসংগ্রাম বন্ধ হয়েছিল ১৯১৯ সালে, ১৯২১–২২ সালে ও ১৯৩০–৩২ সালে।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করা হলে জাতীয় আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হলে সর্বভারতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব করার মতো উপযুক্ত আর কেউ ছিল না। ভারতে খিলাফত আন্দোলন বন্ধ হলে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পুনরায় প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে (১৯২৫–২৬ খ্রি:)। ভারতের তৎকালীন অস্থির পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডের খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতে একটি কমিশন প্রেরণ করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে যা সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। কিন্তু সাইমন কমিশন ব্যর্থ হলে এই পটভূমিতে গান্ধীজি অহিংস উপায়ে আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০–৩২ খ্রি:) শুরু করেন। কিন্তু ১৯৩২ সালের পর জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে ভীত হয়ে গান্ধীজি আর কোনো দিনই গণসংগ্রাম আরম্ভের কল্পনাও করেন নি।[৫]

ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মহানয়ক গান্ধীজির অহিংসার নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তাঁর নীতিতে অহিংসা কেবল ভারতের শ্রমিক কৃষক জনসাধারণেরই অবশ্য পালনীয়, আর সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে রাইফেল ও মেশিনগান হতে গুলিবর্ষণ এবং উড়োজাহাজ হতে বোমা বর্ষণে শ্রমিক-কৃষক হত্যার অবাধ স্বাধীনতা, প্রতিবাদেরও প্রয়োজন নাই। ইহা গান্ধীর অহিংসা নীতির স্বরূপ।[৬]

প্রকৃতপক্ষে ভারতের বুর্জোয়া জমিদারদের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ভারতের গণশক্তিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। এই গণশক্তিকে রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক বুঝে গান্ধী তাঁর পরিচালিত সংগ্রামে শ্রমিক কৃষক জনসাধারণের জন্য বহু প্রকারের শর্ত ও বাঁধা-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। অহিংসা পালনের শর্তটি ছিল তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি অহিংসাকে করেছিলেন তাঁর সংগ্রামের মূল ভিত্তি।[৭] অথচ এই অহিংসা হল গণসংগ্রামের পক্ষে সম্পূর্ণ বিরোধী।

গান্ধী তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। গণসংগ্রাম যাতে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বুর্জোয়া জমিদার গোষ্ঠীর স্বার্থ বিপন্ন না করতে পারে তার উদ্দেশ্যেই গান্ধী তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহের নীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। গান্ধীর মতে— সংগ্রামী

জনসাধারণই, শ্রমিক কৃষকই, ভারতের প্রধান শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে গান্ধী তাঁর অহিংসার নীতিকে পরিচালিত করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ২ মার্চ বড়লাটের নিকট পাঠানো এক পত্রে গান্ধীজি লিখেছিলেন—

"আমার উদ্দেশ্য হল ... ক্রমবর্দ্ধমান সহিংস সংগ্রামকারীদের শক্তির বিরুদ্ধে আমার শক্তিকে (অর্থাৎ অহিংসাকে) পরিচালিত করা।"[৮]

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জানুয়ারি জাতির জনক ও অহিংস আন্দোলনের পূজারী মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাকক্ষে নাথুরাম গডসের গুলিতে মারা যান। সারাজীবন যিনি অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর মৃত্যু হল হিংসাত্মক আঘাতে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর বক্তব্য হল—

"গান্ধীজি হলেন রক্ত মাংসে গড়া এক জীবন্ত ভারতবর্ষ।"[৯]

তাই তাঁর মহান ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র সমালোচনায় কলুষিত করা ঠিক নয়। 'জনগণের বাপুজি' তিনি আজও আমাদের মনের মণিকোঠায় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. অধ্যাপক সৃজিৎ কুমার মন্ডল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিবৃত্ত, তপতী পাবলিকেশন, কোলকাতা-৯, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৩৮-৩৯।

২. সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ-নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৩১।

৩. গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী, আধুনিক ভারত ও বিশ্ব (বিভাগ- ক, আধুনিক ভারত), সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা. লি., কলকাতা, এপ্রিল, ২০১২, পৃ. ৪, ৫, ৬, ৭।

৪. অধ্যাপক এস. ঘোষ, আধুনিক ভারতের ইতিহাস (১৮১৮–১৯৬৪), জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৭৮, ৪৮৪।

৫. অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, মৌলিক লাইব্রেরী, কোলকাতা, পৃ. ৪৬৯।

৬. সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ-নভেম্বর, ২০১৫,, পৃ. ৩৩।

৭. সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ-নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৩২।

৮. সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ-নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৩৪।

৯. অধ্যাপক সৃজিৎ কুমার মন্ডল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিবৃত্ত, তপতী পাবলিকেশন, কোলকাতা-৯, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৩৮-৪০।